দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 4 ... কলাম ... 2 ...

AUG 25 2002

'ফেল' কলেজের ইতিকথা

দেশের কলেজ শিক্ষার করুণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে গত শুক্রবার দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক তরুণ রিপোর্টারের প্রতিবেদনে। তিনি 'ফেল' করা কলেজের ইতিকথা তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাহার রিপোর্টের শিরোনাম, 'কলেজ আছে, ছাত্র-ছাত্রী নেই। 'ফেল' কলেজের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিস'। উহাতে বলা হইয়াছে, দেশের ৩৫টি কলেজের একজন ছাত্র-ছাত্রীও সদ্য প্রকাশিত ডিগ্রী পরীক্ষায় পাস করিতে পারে নাই। এই সকল কলেজের অনেকগুলি হইতে মাত্র ১ হইতে ৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ডিগ্রী পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের কেহ পাস করিতে না পারায় পাসের হার দাঁড়াইয়াছে শূন্য। এহেন কৃতিত্বের ভাগীদার 'ফেল করা' কলেজগুলির মধ্যে সরকারী কলেজের সংখ্যা খুব কম নহে। ফলে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং কলেজ শিক্ষার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন চাহিয়াছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তাহাকে অতিশীঘ্র প্রতিবেদনটি পাঠান হইবে। এতদ্ব্যতীত 'ফেল করা' কলেজগুলিকে কারণ দর্শাও নোটিস পাঠান হইতেছে। তাহাদের কারণ দর্শানোর উত্তর যথোপযুক্ত না হইলে কলেজের সরকারী স্বীকৃতি বাতিল করা হইবে।

সংবাদসূত্রে জানা যায়, চলতি বৎসরে সারাদেশে ৬৫১টি ডিগ্রী কলেজ হইতে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ১৯৮ জন পরীক্ষার্থী ডিগ্রী পরীক্ষা দিয়াছিল। ইংরাজী বিষয়ে ৫ নম্বর কমন গ্রেস দেওয়ার পর পাসের হার দাঁড়ায় ৩৪ দশমিক ২৯। ইহার মধ্যে পাসের হার এক শতাংশ হইতে ৩০ অর্জন করিয়াছে ১৯০টি কলেজ। উক্ত তালিকায় ২২টি সরকারী কলেজের নাম আছে। ঊর্ধ্বে ২৫ শতাংশ পাসের হার অর্জন করিয়াছে ৪৪টি কলেজ। দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ৩৫টি কলেজ হইতে একজন ছাত্র-ছাত্রীও পরীক্ষায় পাস করিতে পারে নাই। ফলে ঐ সকল কলেজগুলিকে 'ফেল করা' কলেজ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবে অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে মুরাদনগরের একটি কলেজ। উহার ৮৮৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৪ জন পাস করিয়াছে। নন্দাইলের একটি কলেজ হইতে ১ হাজার ৫৩ জন পরীক্ষা দিলেও ১৩০ জন পাস করিয়াছে। সৈয়দপুরের একটি কলেজ হইতে ৯২৬ জন পরীক্ষা দিয়া ১২০ জন পাস করিয়াছে। এই বৎসর ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করিতে গিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হতাশ হইয়াছেন।

দেশের কলেজ শিক্ষার এই অবস্থা কেন? ইহার জবাব খুঁজিতে গিয়া দেখা যায় দেশের স্থানে স্থানে কারণে বা অকারণে কতিপয় কলেজ নামীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গজাইয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল শিক্ষায়তনসমূহে প্রতিষ্ঠা করিতে যতটা প্রচেষ্টা চালান হইয়াছে, লেখাপড়ার ব্যাপারে ততটাই উদাসীনতা ছিল। যেনতেন প্রকারে কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐগুলিকে এমপিওভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া সরকারী অনুদানপ্রাপ্তির প্রচেষ্টা চালানই ছিল মূল লক্ষ্য। কিন্তু সরকারী কলেজ কিভাবে এই কৃতিত্বপূর্ণ কলেজগুলির তালিকায় স্থান পাইল, তাহা ভাবিয়া দিশা পাওয়া যায় না। যদি একজন পরীক্ষার্থীও কলেজ হইতে পাস না করে, তাহা হইলে ঐসব সরকারী কলেজ রাখিয়া কি লাভ? আসলেও নিয়ম করা উচিত যে, কোন কলেজের শতকরা ৩৩ জন ছাত্র পাস না করিলে ঐসব কলেজ 'ফেলা করা' কলেজরূপে পরিগণিত হইবে। ঐগুলিকে অবস্থার উন্নয়ন করিতে এক বৎসর বা দুই বৎসর সময় দেওয়া যাইতে পারে। পরবর্তীতে তাহাদের অবস্থার কোনরূপ উন্নতি না ঘটিলে কলেজগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কবে কোন কলেজ হইতে এক-আধজন ছাত্র পাস করিবে, ঐ আশা লইয়া দিনের পর দিন একটি কলেজ খুলিয়া রাখা যায় না। কলেজের তকমা কপালে আঁটিতে হইলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর পাসের হার অর্জন করিতে হইবে। 'ফেল করা' কলেজগুলিকে ভুয়া কলেজ বলিয়া আখ্যায়িত করা আবশ্যক।

দেশে শিক্ষার মান দিনে দিনে নামিয়া এখন কোথায় দাঁড়াইয়াছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। গত কিছুদিন যাবৎ পরীক্ষায় কমন গ্রেস দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। ঐ কমন গ্রেস দিয়া শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষায়তনের গা বাঁচাইবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। সত্যিকার মান অর্জন না করিয়া কোন ছাত্র-ছাত্রী যখন পরীক্ষায় পাস করিয়া সার্টিফিকেট লাভ করে, তখন ঐ সার্টিফিকেটটি নিতান্ত একটি কাগজের টুকরা ব্যতীত আর কিছু নহে। শিক্ষার মান বাড়াইতে না পারিলে আন্তর্জাতিক অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ পিছাইয়া পড়িবে। এমনিতে বাংলাদেশের শিক্ষায়তনের সার্টিফিকেটের কোন মূল্য বা স্বীকৃতি অন্যান্য দেশের শিক্ষায়তনে দেওয়া হয় না। সেই আশা ত্যাগ করিলেও নিজের দেশের চাকুরী বাজারেও কিছুকাল পরে এই দেশের শিক্ষায়তন হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেটকেও অগ্রাহ্য করা হইবে। ফলে শিক্ষাব্যবস্থাকে কলেজগুলিতে কার্যকর করিতে হইলে সকল কলেজের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট মান স্থাপন করিতে হইবে। পরীক্ষার মানও নির্দিষ্ট করিয়া 'কমন গ্রেস' প্রদানের প্রবণতা পর্যায়ক্রমে পরিহার করা আবশ্যক। ❑